৩১-০৫-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়া তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাহারায় আছে। সুতরাং সামান্য গাফিলতিও করো না যেন। লাগাতার দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার পুরুষার্থে ব্যস্ত রাখো নিজেকে"

প্রশ্ন :- সর্বদাই কিসের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে বাবার কাছে ? কি এমন উপায় আছে সেই ভান্ডারের সম্পদে নিজেকে ভরপুর করার ?

উত্তর :- পবিত্রতা-সুখ-শান্তির ভাণ্ডার সদাই ভরপুর থাকে বাবার কাছে। স্থায়ীরূপে সুখ আর শান্তি চাইলে, দিশাহীন ভাবে বনে-জঙ্গলে ঘোরা-ঘুরির প্রয়োজন নেই। পবিত্রতাই সুখ আর শান্তির মূল আধার। পবিত্র হতে পারলেই তোমারও সব ভাণ্ডার ভরে যাবে। বাবার এই আগমন তো বাচ্চাদেরকে পবিত্র করে গড়ে তোলার জন্যই। বাবা যে স্বয়ং সদাকালের পবিত্র।

গীত :- হবেন না তিনি কখনোই আমার মন থেকে দুর,
আছেন যে হৃদয়েরই গভীরে
যে ফাঁস লেগেছে হৃদয়ে তা ছাড়াবি কেমনে

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চাদের দ্বারা গাওয়া গীত তোমরা বাচ্চারাই শুনছো। বাচ্চাদের আত্মাই তা গেয়েছে। অতএব, বাচ্চাদেরকে এখন দেহী-অভিমানী হতে হবে অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে 'আত্মা' নিশ্চয়তা আনতে হবে। তবে এমনটা মোটেই হয় না যেন নিজেদরকেই পরমাত্মা ভেবে বসলে। যেমন জাগতিক সন্ন্যাসীরা বলে থাকে- "যাহা আত্মা - তাহাই পরমাত্মা।" যার ফলে তা এমন হয়ে দাঁড়ায় গঙ্গা যেন উল্টো দিশায় বইছে। তাই বাবা এখন বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, এতদিন ধরে তোমরা 'দেহ-অভিমানী' ভাবে চলে আসছো, কিন্তু এবার 'দেহী-অভিমানী' হও। এই বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যেহেতু এবার ঘরে ফেরার পালা। বাচ্চারা, সত্যযুগ তোমাদের প্রালব্ধের যুগ। যদি এখানে তোমরা 'দেহী-অভিমানী' হয়ে বাবার এই জ্ঞানকে সঠিক ভাবে গ্রহন করতে পারো, তবেই পরবর্তীতে জ্ঞানের প্রালব্ধে তদনুরূপ কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করার সুযোগ পাও। সেখানে (সত্যযুগে) দেহ-অভিমান বা দেহী-অভিমান - এ সবের প্রশ্নই নেই। বর্তমানে মানুষেরা এটাই জানে না, প্রকৃত অর্থে তারা আত্মা। আর তাদের (আত্মাদের) প্রকৃত বাবা পরমাত্মা। একেবারে হতবুদ্ধির হয়ে আছে যে তারা। যেহেতু জাগতিক সন্ন্যাসীরা যেখানে বলে থাকে - আমরা, তোমরা, সবাই পরমাত্মা। যেদিকেই তাকাই, কেবল তুমিই তুমি। কিন্তু তাতে কি কিছু লাভ হয় - তা তো হয় না। লোকেরা কেবল তাদের ভাবনায় তা ভাবে। কিন্তু সবার ভাবনা তো আর একই প্রকারের হয় না। একই পরিবারে বাবা আর ছেলের ভাবনাও এক হয় না। কোথাও আবার দেখো, বাচ্চা তার নিজের বাবাকেই হত্যা করে। যেহেতু বর্তমান সময়টা পাপের ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাই সবাই এমন অপবিত্র-পতিত হয়ে আছে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়েছো। সদা স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়ে চলতে পারলে আগামীতে তোমরাই রাজা-রাণীর মত হতে পারবে। তাই তো তোমাদের এই বাবা বার-বার বলতে থাকেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও। নিজের মনে এমন ভাবনা পাক্কা করো, তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে, স্বয়ং পরমাত্মা বাবা শিক্ষাদানও করছেন আবার নিজের প্রকৃত পরিচয়ও জানাচ্ছেন।

নানা পদ্ধতিতে তোমাদের আত্মার পুরোনো সংস্কারগুলিরও পরিবর্তন করার প্রয়াস করে চলেছেন। এই আত্মার মধ্যেই যে সংস্কারের প্রলেপ পড়ে থাকে, যা পরবর্তীতেও আত্মার মধ্যেই সেই সংস্কার থেকেই যায়। কিন্তু শরীরের বিনাশ হয়ে যায়। তোমাদের আত্মাই শরীরের মুখ ইন্দ্রিয় দিয়ে এসব কথা বলে থাকে। আত্মরাই আবার এও বলে, "বাবা এবার থেকে কেবল আপনার সাথেই স্মরণের যোগে ব্যস্ত থাকবো আমি। আমার এই শর্ত কখনই ভঙ্গ হবে না বাবা। যদিও পবিত্রতার কারণে অনেক প্রকার বাধা-বিঘ্নও আসবে। অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনাও সইতে হবে। কিন্তু তোমার এই কন্যা সবকিছু অন্যায়-অত্যাচারকেও সহ্য করবে।" তখন বাবা বলন- যেমন দুঃখ-কষ্টে মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, "হায় রাম", "হে প্রভু",-এমন কথাও কিন্তু বলা চলবে না তোমাদের। তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরা এইভাবেই বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরাই আবার বাবার কাছে জানতে চাও, "বাবা, আমাদের এই দুঃখের অবসান কবে হবে ? আমাদের যে অনেক মার-ধোরও সহ্য করতে হয়।" গীতেও তার বর্ণনা আছে, "যতই অন্যায় অত্যাচারের আঘাত সহ্য করতে হোক না কেন, বাবা তোমাকে স্মরণ করা থেকে বিচ্যুত হবো না মোরা। যেমনটি বাবার ছিলাম, তেমনটি বাবারই আছি, এর পরেও বাবারই থাকবো মোরা। একমাত্র বাবার হয়েই যে থাকতে হবে মোদের। মন-বুদ্ধির যোগ যেন এই বাবার সাথেই জুড়ে থাকে।" এটাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। কোনও একদিন তো অবশ্যই এই অন্যায়-অত্যাচারের অবসান হবে। তাই এখন কিছু-কিছু অত্যাচার সহ্য তো করতেই হবে। অবিনাশী ড্রামাতেও এমনটাই যে আছে। অবলাদের প্রতি অত্যাচারও অনেক হয়ে থাকে। তাই তো কত পূর্ব থেকেই এই গীত রচিত হয়ে আছে। যার নেপথ্যের প্রকৃত অর্থ জগতের লোকেরা জানেই না। শাস্ত্রগুলিতে যেন রেকর্ডের মত পূর্ব থেকেই তা লিখিত হয়ে আছে। কিন্তু তবুও লোকেরা বলবে, এমনটা কখনও হতে পারে না যে, এইভাবে রেকর্ডের গীতের অর্থের সাথে একে মেনে নেওয়া যায়। এসব তো কেবল সিনেমার গানের রেকর্ড। সে যাই হোক না কেন, এরও রচয়িতা তো এই বাবা-ই। বাচ্চারা, লোকদেরকেও ঠিক এভাবেই বোঝাতে হবে। যে কোনও প্রকারেই হোক, পবিত্র যে হতেই হবে। বাবার নির্দেশাবলীও মেনে চলতেই হবে। যদিও সাধারণ মানুষেরা এত সহজে তা বুঝতে চাইবে না। তারা তো শিব আর শংকরকে একই জন ভেবে দুজনকেই এক করে ভাবে। এমন কি, লোকেরা তো ভক্তির ঘোরে কৃষ্ণকেও ভগবান মেনে এমন ভাব করে, যেন তাকে ডাকলেই কৃষ্ণ এসে হাজির হবে। যেদিকেই তাকাও কেবল কৃষ্ণই- কৃষ্ণ। আবার যে রাধার পূজারী হয়- সে বলবে, যেদিকেই তাকাও কেবল রাধা আর রাধা। তেমনি সাঁই-বাবার অনুগামীরা বলবে, চারিদিকেই দেখো কেবল সাঁই আর সাঁই ..... সত্যি কি অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে লোকেরা ! অবশ্য এমনটা যে হবারই ছিল। অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট যে এভাবেই লেখা হয়ে আছে বহু পূর্ব থেকেই।

বাচ্চারা, তোমরা যদি লোকেদের বোঝাও, তোমাদের এই জ্ঞান যজ্ঞের যে শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে তা বিনাশের কার্য সম্প্রদান করার হেতু। তখন তাতেও আবার তারা বলবে, বি.কে.দের বাবা এমন জ্ঞান-যজ্ঞেরই রচনা করাচ্ছেন, যার দ্বারা কেবল বিনাশ কার্যই সম্পাদিত হয়। একদিকে জগতের লোকেরা যেখানে শান্তির কামনা করছে, অপরদিকে তোমরা বি.কে.-রা বিনাশের কথা বলছো ? যেহেতু এই যজ্ঞের নাম রুদ্র-জ্ঞান যজ্ঞ। আবার সেই কার্যও চলে বি.কে. ব্রাহ্মণদের দ্বারা। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণেরা হলে তোমরা ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীরা। জাগতিক ধনী ব্যাবসায়ীরা তো জাগতিক রীতি-নিয়মে জাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক্রিয়া-কর্ম করে থাকে। কিন্তু একমাত্র এই রুদ্র-যজ্ঞেরই যত নাম-যশ ও মহিমা। লোকেরা যেসব যজ্ঞ করে তাতে কিন্তু জ্ঞান শব্দ থাকে না। আর তোমাদের এই যজ্ঞ হলো রুদ্র-জ্ঞান যজ্ঞ। কিন্তু জগতের লোকেদের সেইসব যজ্ঞে জ্ঞানের প্রশ্নটাই

নেই। তাই বাবা এবার বুঝিয়ে বলছেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ -এদের মধ্যেও তখন সেই জ্ঞানই তো আর থাকে না। এই জ্ঞান পেয়ে তা অর্জন করেই তো তাদের সদগতি হয়। ফলে তারা তা হতেও পেরেছে। জ্ঞানের দ্বারাই প্রকৃত সদগতি হয়। স্বর্গ-রাজ্য তো সদগতি প্রাপ্তধারীদেরই রাজ্য-রাজত্ব। এইসব বিষয়গুলিকে ভাল করে বোঝার ব্যাপার। এখানে বসে বাবা স্বয়ং এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন ওনার ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের। অথচ লোকেরা বলে, রথের উপর বসে রথী সেই জ্ঞান শুনিয়েছিল। এই শরীরকেও তো রথ বলা হয়। প্রত্যেকের রথেই আত্মারূপী রথী-ই তো রয়েছে। তেমনি ব্রহ্মাবাবার রথেও শিববাবার আত্মা অবস্থান করছেন। তাই শিববাবা তা স্বীকার করেই বলেন, ভাড়া স্বরূপ ব্রহ্মাবাবার এই রথকে আধার করে, সেখানেই অবস্থান করছেন তিনি। যেমন বাড়ীতে কোনও ভাড়াটে রাখলে, সেই একই বাড়ীতে বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটে উভয়েই বাস করে, ঠিক তেমনই বাবাও ওনার (ব্রহ্মার) রথে (শরীরে) একসাথেই উভয়ের আত্মাই সহবস্থান করছে।

বাবা জানাচ্ছেন, আবারও উনি এসেছেন বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শেখাবার জন্য। এই বিশেষ শিক্ষার শিক্ষাদানের কথা একমাত্র উনি ছাড়া আর কেউই তা করতে পারে না। তোমাদের এইসব পয়েন্টগুলি বোঝানো হচ্ছে, ধারণা আনার জন্য। তোমাদের এই বাবা স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানিয়ে চলেছেন কল্প-কল্প ধরে, আসেন কেবলমাত্র এই সঙ্গমযুগেই। শুধুমাত্র একটি শব্দের ভুলের জন্য, বাবার নামের বদলে কত অবতার, কত কিছুর নাম লেখা হয়েছে অজ্ঞানী শাস্ত্রকারদের দ্বারা। কিন্তু এখন সত্যিকারের কল্প-বৃক্ষের নীচে বসে আছো তোমরা। তার সাথে যে রাজযোগ শিখছো তা আগামী ভবিষ্যতের রাজা-রাণীর পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে। বর্তমান দুনিয়ার লাখপতি-কোটিপতি সবারই সবকিছু মাটিতেই মিশে ধুলায় পরিণত হবে। হঠাৎ-হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে, অবশেষে সবকিছুর বিনাশ তো অবশ্যই হবে। কত শত বোম্-ও বানানো হয়েছে, যা সবার কাছেই আছে, কেবলমাত্র সেই নিমিত্তেই। তারা যেগুলি বানিয়েছে তা তো আর সমুদ্রে ফেলে দেবার জন্য নয়, যা তাদের লাখ-লাখ কোটি-কোটি টাকার সম্পত্তি মনে করে। আবার এই বম্ব তৈরী না হলে, বিনাশ বা হবে কেমন করে। এক মুহূর্তেই সবকিছু জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তবে এমন কিছু হবে না যে, লোকেরা আহত হয়ে দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রনা ভোগ করতেই থাকবে। এমনই জিনিষ তৈরী হয়েছে, যাতে মুহূর্তেই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। এর দ্বারাই তো হবে, আগামীতে এক ধর্মের স্থাপনা আর অনেক ধর্মের বিনাশ। এবার তো তা স্পষ্ট হলো। ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা শুরু হয়ে গেছে। এদিকে বাবাও স্বয়ং স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত করে গড়ে তুলছেন বি.কে.-দেরকে। যেমন, পবিত্র আত্মাদের সামনে নতশিরে সবাই নমন জানায় - বাবা তাই বলছেন, বাচ্চারা তোমরাও পবিত্র হও। তোমাদের আত্মার ডানা ভেঙে গিয়েছে, তোমরা উড়বেই বা কেমন করে ? যত বেশী জ্ঞান-যোগের বল ধারণ করতে পারবে, তোমাদের আত্মার ডানাও তত শক্তিশালী হতে থাকবে। স্বর্গ-রাজ্যের রাজধানীর রাজত্ব পাওয়া মাসীর বাড়ীর নয়, কোনও ছেলেখেলা ব্যাপার নয়।

বাবা জানাচ্ছেন - প্রধান কথাই হলো "আমি আসলে আত্মা আর এটা হলো আমার শরীর।" প্রকৃত অর্থে আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ। এই শান্তি পাবার জন্য এদিক-ওদিক ঘোড়া-ঘুড়ি বা ঠেলা-ধাক্কা খাবার প্রয়োজন হয় না। যেমন এক গল্পে আছে, রাণীর হার তার নিজের গলাতেই আছে, অথচ বাইরে চতুর্দিকে সবাই তা খুঁজে চলেছে। আর এখানে তো তোমরা সবাই রাণী। তাছাড়া শান্তির জন্য কোনও বন-জঙ্গলে যাবার প্রয়োজন পড়ে না। বর্তমানের এই দুনিয়াটাই হলো মায়া-নগরী। তাই যে রাজত্বে শান্তিই নেই, সেখানে শান্তি পাবেই বা কি করে ! তবুও হয়ত কেউ বলে, অমুকের মাধ্যমে সে

শান্তি পেয়ে থাকে। তা হলেও, তা তো অতি স্বল্প কালের কাক-বিষ্টার তুল্য সুখ কিম্বা শান্তি। যেখানে তোমাদের প্রয়োজন অবিনাশী শান্তি। অর্থাৎ তোমাদের দরকার স্থায়ী শান্তির। পবিত্রতা ধারণ করে যত খুশী সুখ ও শান্তি নিতে পারো। এটা তো শিববাবার অফুরন্ত ভাণ্ডার। যিনি সদা কালের পবিত্র, তিনি স্বয়ং এসে সবাইকে পবিত্র বানান। এদিকে জাগতিক সন্ন্যাসীরা ভাবে, আত্মা নির্লেপ হয়। শরীরই পাপ ধারণ করে। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা তো এখন জানতে পেরেছো, তোমাদের এই বাবা-ই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনাকারী। তোমরা নিজেরা যথার্থ রীতিতে বুঝে অন্যদেরকেও তা বোঝাবে। প্রতি কল্পেই তেমাদের অর্থাৎ আত্মাদের যিনি এ ভাবেই পড়িয়ে থাকেন-তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। যাকে আবার পতিত-পাবন সদগতি দাতাও বলা হয়। সবাইকেই দুর্গতি থেকে সদগতিতে তিনিই নিয়ে যান। বাচ্চার সদগতি তো বাবারাই করবে, তাই না ! আর এই বাবার নামই তো সদগতি-দাতা। উনি এমন কোনও কারণ ঘটায় না যে, ওনাকে দুর্গতি-দাতা বলা যেতে পারে। ওনাকে আবার পতিত-পাবনও বলা হয়। কিন্তু আত্মাদের পতিত বানায় কে ? যা লোকেরা কেউ জানেই না। বাবা কারণ জানিয়ে বলেন, যখন থেকে বাম-মার্গের নিম্নগতিতে তোমাদের পতন হতে থাকে, তখন থেকে দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে রাবণের প্রবেশ ঘটে।

মন্দিরগুলিতে বড়-বড় আকারের কালো পাথরের রাধাকৃষ্ণের মূর্তি রাখা থাকে। নীচে পরিচয় হিসাবে লেখা থাকে "শ্যাম-সুন্দর।" (অর্থাৎ শ্যাম বা কালো থেকে উজ্জ্বল-সুন্দর) যিনি সত্যযুগে ছিলেন উজ্জ্বল স্বর্ণাভ সুন্দর, তারপর কলিযুগে মায়া-সর্পের দংশণের বিষে তিনিই এমন কুৎসিত-কদাকার কালো হয়ে যায়। অথচ ভাবো, লোকেরা কোন সময়কার তথ্যকে গল্প বানিয়ে কোন সময়ের সাথে জুড়ে দিয়েছে। আসলে লোকেরা এসবের প্রকৃত তথ্যটাকেই যে জানে না। এমন কি তারা তো রচয়িতা বাবা ও ওঁনার রচনাকেও জানে না। তাই বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমাদের কিন্তু খুব সতর্ক থাকতে হবে, মায়া যেমন শক্তিশালী তেমনি ভয়ঙ্করী। তার উপরে বর্তমান সময়ে মায়া চূড়ান্ত তমোপ্রধান অবস্থায়। এমত অবস্থায় কাউকেই তুলে আছাড় দিতে দেরী করবে না সে। নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে-ঘোরাতে ছুড়ে ফেলে দেবে। আর এটাই তোমাদের প্রকৃত যুদ্ধস্থল। তাই বাবা বার-বার তোমাদের বুঝিয়ে চলেছেন - বি.কে. বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের কল্যাণ চাইলে, অবশ্যই দেহী-অভিমানী হয়ে চলো। নিজেকে আত্মা ভেবে পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তোমাদের অন্তিম ভাবনাতেই তোমরা সেই নির্দ্দিষ্ট দিশায় পৌঁছে যাবে। অন্তিমে তোমাদের সংস্কারগুলিই সব তোমাদের সামনে এসে হাজির হবে। এত জন্মের পাপের বিনাশ হতে সময় তো লাগবেই। তাই অন্তিম সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে এই পুরুষার্থ চালিয়ে যেতে হবে। পুরুষার্থের প্রথম এবং প্রধান কথাই হলো -দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। পরমাত্মা বাবা তোমাদের আত্মাকে এই পাঠের দ্বারা বাবার মতন করে গড়ে তুলছেন। যেমন যখন কোনও ব্যারিস্টার অন্যকে ব্যারিস্টারীর পাঠ পড়ায়, তখন সে চায়, তার সেই ছাত্রও যেন তার মতনই ব্যারিস্টার হতে পারে। অবশ্য এসব কিছুই নির্ভর করে বিদ্যার্থীর নিজের পুরুষার্থের উপর। আবার এমনও হয় কোনও ব্যারিস্টার একটা কেসেই লাখ টাকা রোজগার করে। তাই বাচ্চাদেরকে বাবা বলছেন- তোমরা এমন ভাবে পুরুষার্থ করো, যেন অনেক উচ্চ-পদের দাবীদার হতে পারো। এই দুনিয়ার লাখপতি-কোটিপতির সবকিছুই তো ধূলায় মিশে যাবে। কিন্তু তোমাদের এই দীনবন্ধু-কৃপাসিন্ধু বাবা তো আছে কেবল বাচ্চাদের জন্যই।

এবার বাবা জানাচ্ছেন - যারা যুদ্ধ করে, তাদের কাজই হলো, হয় মারো-নয়তো মরো। মৃত্যুর পরে তাদের আত্মারাও সেই সংস্কারই সাথে নিয়ে যায়। যদিও তাদের পরবর্তী জন্ম সেই গৃহস্থ পরিবারেই হবে, তবুও কিন্তু তাদের লড়াকু স্বভাবই হবে। দেখ, কত সহজ-সরল পদ্ধতিতে বাবা তা বুঝিয়ে দিলেন। এতবার জন্ম নিতে নিতে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ জমে আছে ঘাড়ে, তাই খুব সুন্দর ভাবে যোগযুক্ত হতে পারলেই সেইববিকর্মগুলি বিনাশ হতে পারবে। এছাড়া এই পাপের বোঝা হাল্কা করবেই বা কি প্রকারে ! অতএব যতটা বেশী সম্ভব বাবাকে স্মরণ করা উচিত। তখন বাচ্চারা বলে, বাবা সত্যি তুমি কি মিষ্টি! বাবাও প্রতি উত্তরে বলেন - ওগো আমার আদরের বাচ্চারা, এবার থেকে তোমরা যেন আর কোনও ভুল কোরো না। মায়া খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাহারা দিচ্ছে তোমাদের, অতএব দেহী-অভিমানী ভাবে থাকো তোমরা। এটা এক প্রকারের বুদ্ধিযোগের দৌড় প্রতিযোগিতা। এর মধ্যেই যাবতীয় সবকিছু রয়েছে। তাই বাবা এতবার করে জানাচ্ছেন, নিজের কল্যান চাইলে, যোগের অভ্যাসে পাকা-পোক্ত হতে হবে। একমাত্র তবেই খুব আনন্দে থাকতে পারবে। বাচ্চারা, তোমরা বি.কে.-রা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। ভবিষ্যতের সৌভাগ্যের জন্য বাবার অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা তোমরাই সর্বাগ্রে পেয়ে থাকো। তাই কলিযুগ থেকে তোমাদের আগমন শুরু হয় না। তোমরা রাজ্য-ভাগ্য লাভ করো কল্প শুরুর সত্যযুগ থেকেই। তাই সেই উচ্চতায় পৌছতে তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী হতেই হবে। এত সহজে কি আর বিশ্বের মালিক হওয়া যায়! কত প্রকার দুঃখ-কষ্ট, ঝড়-ঝাপটা সহন করতে হবে তোমাদের। এই বন্ধনে যুক্তদেরকে কত মার-ধোরও সইতে হয় তোমাদেরকে। শেষে কিন্তু তোমাদেরই জয় হয়। অতএব তোমরা লাগাতার বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। তোমাদের এই স্মরণের যোগই আসল বল অর্থাৎ যোগবল। যা কেবল এক ও একমাত্র এই বাবা-ই শেখান তোমাদের। যা ধারণ করতে পারলে সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারো তোমরা। এমনটি আর কেউ পারে না। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের পুরো অবিনাশী ড্রামায় সর্বশ্রেষ্ঠ পার্টধারী হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। যেমন একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, দুই বিড়ালের মধ্যে ঝগড়ার সুযোগে, বাঁদর পিঠে খেয়ে পালালো। ঠিক তেমনই, কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়। যা কেবল উদাহরণের জন্য, সেখানে বস্তু মাখনের ব্যাপার নয়। স্বর্গ-রাজ্যকে মাখন হিসাবে বোঝানো হয়েছে। যার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি-জগৎকে মাখন হিসাবে বলা হয়েছে। এই বাবা-ই তোমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক করে গড়ে তোলেন। এমন বাবার সান্দিধ্যে মিলিত হবার জন্য তো অনেক দূর থেকেও দৌঁড়ে আসা যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) আমি আত্মা, রথী রূপে এই রথে বিরাজমান। এই অভ্যাস করতে করতে সম্পূর্ণ রূপে দেহী-অভিমানী হতে হবে। বুদ্ধি-যোগের প্রতিযোগিতা করতে হবে।

২) সম্পূর্ণরূপে নষ্টোমোহা হতে হবে। এই অন্তিম জন্মে হাজারো-অন্যায় সহ্য করেও পবিত্র হতেই হবে।

বরদান :- সদা নিজে দিলখুশ মিঠাই খেয়ে আর অপরকেও খাইয়ে প্রকৃত সেবাধারী সদানন্দ ভব

বিস্তার :- যে রোজ অমৃত-বেলায় দিলখুশ মিঠাই খায়, সে নিজে যেমন সারাদিন খুশীতে থাকে তেমনি অন্যেরাও তাকে দেখে খুশী হয়ে যায়। এই দিলখুশের খাবার যে কোনও পরিস্থিতিকেই হাল্কা ও ছোট করে দেয়। পাহাড়ের মতো ভারীকেও তুলোর মতো হাল্কা বনিয়ে দেয়। অতএব সদা স্মৃতিতে সজাগ থাকবে, আমি নিজে যেমন দিলখুশ মিঠাই খাব, অন্যদেরকেও তা খাওয়াতে হবে। এমন কি অশ্রুসজল নয়নেও মনে সদা খুশী রাখতে পারলে, তবেই বলা যাবে সদানন্দ-সচ্চিদানন্দ। তার এমন চেহরাতেও সেবা হয়ে যায়। যেহেতু চেহারাতেই জ্ঞানের ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়।

স্লোগান :- যার প্রতিটি সংকল্পের থেকে অনেকের শ্রেষ্ঠ জীবন গড়ার প্রেরণা প্রাপ্ত হয় - সে-ই হল পুণ্যাত্মা।